1. মডিউলটির সম্পর্কে বিশদ আলোচনা

মডিউল বিশদ	
বিষয়ের নাম	অর্থনীতি
কোর্সের নাম	অর্থনীতি 01 (একাদশ শ্রেণি, সেমিস্টার - 1)
মডিউলের নাম/ শিরোনাম:	মানব মূলধন গঠন - পর্ব 1
মডিউল আইডি	Keec_10101
পূর্ব প্রয়োজনীয় জ্ঞান	ঔপনিবেশিক শাসন জাতীয় আয় ও অর্থনীতির বিভিন্ন সেক্টর এই সমস্ত শব্দগুলি বিষয়ে অবহিত থাকবে।
উদ্দেশ্য	• এই অধ্যায়ে অধ্যয়নের পর শিক্ষার্থী ভারতের স্বাধীনতার সময় কালে ভারতীয় অর্থব্যবস্থার অবস্থা সম্পর্কে বুঝতে পারবে। • ভারতীয় অর্থনীতির উন্নয়ন এবং স্থবিরতার কারণ সমূহ সম্পর্কে বুঝতে পারবে।
মূল শব্দ গুচ্ছ	কৃষির বাণিজ্যিকরণ, সুতা ও পাট টেক্সটাইলের কারখানা, জনবিন্যাসের পরিবর্তন, হস্তশিল্প, শিশু মৃত্যুর হার, আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি, ভূমি বন্দোবস্ত, রেল, টেলিগ্রাফ, জমিদারি প্রথা।

2. উন্নয়ন দল

Role	Name	Affiliation
National MOOC Coordinator (NMC)	Prof. Amarendra P. Behera	CIET, NCERT, New Delhi
Program Coordinator	Dr. Rejaul Karim Barbhuiya	CIET, NCERT, New Delhi
Course Coordinator (CC) / PI	Prof. Neeraja Rashmi	DESS, NCERT, New Delhi
Subject Matter Expert (SME)	Dr. Janmejoy Khuntia	School of Open Learning, University of Delhi
Translator	Sathi Saha Chakraborty	Former Teacher, St. Marys's English High School

সূচীপত্র:

1. সূচনা
2. জনসংখ্যার পরিস্থিতি
3. বৃত্তিমূলক জীবিকা কাঠামো
4. পরিকাঠামো
5. কৃষিক্ষেত্র
6. শিল্পক্ষেত্রে
7. বৈদেশিক বাণিজ্য
8. সারাংশ

সূচনা

স্বাধীনতার 70 বছর পরেও, (1947-2017) ভারত বর্ষ পৃথিবীর মধ্যে নিম্ন আয় ভুক্ত দেশ গুলির মধ্যেই বিবেচিত হয়। ভারতবর্ষের এইরূপ অর্থনৈতিক অবস্থার কারণ গুলির অন্যতম প্রধান কারণ হলো ভারতে ঘটে যাওয়া নানা ঐতিহাসিক ঘটনা সমূহ। 1947 সালে ভারত স্বাধীন হবার পরে, ভারত সরকার দ্বারা প্রবর্তিত যে অর্থনীতি তা আসলে 200 বছর ধরে চলা ব্রিটিশ শাসনের ফলে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত দৃষ্টিভঙ্গিরই ফসল। সুতরাং ব্রিটিশ সরকার দ্বারা যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু হয়েছিল, তার সম্পর্কে জানা সম্যক প্রয়োজন। অতএব, আমরা এই অধ্যায়ে স্বাধীনতার সময়ে ভারতের জনবিন্যাস, জীবিকা বিন্যাস ও পরিকাঠামো, কৃষিক্ষেত্র, শিল্পক্ষেত্র এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর বিশ্লেষণ কেন্দ্রীভূত করব।

জনসংখ্যার পরিস্থিতি

যেকোনো একটি অর্থনীতিতে জনগণের পরিস্থিতি বিভিন্ন তথ্যের উপর নির্ভর করে- যেমন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, সাক্ষরতার হার, মৃত্যুহার প্রভৃতি। 1872 সালে ভারতে প্রথম আদমশুমারি বা জনগণনা সংঘটিত হয়েছে, কিন্তু খুবই অগোছালোভাবে। অতঃপর 1881 সালে গঠিত জনগণনার মাধ্যমে সর্ব প্রথম ইংরেজ শাসনাধীন ভারতের জনসংখ্যা বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। এই ঘটনার কিছু সীমাবদ্ধতা থাকলেও, এই গণনাই প্রথম ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও মৃত্যুহারের অসমতা প্রকাশ করেছিল। পরবর্তীকালে, 10 বছর পর পর এই আদমশুমারি সংঘটিত হয়েছিল।

তিনটি পর্যায়ে এই থিয়োরি কে বিশ্লেষণ করা যায়-
প্রথম পর্যায়, যেখানে জন্মহার এবং মৃত্যুহার দুইই খুব বেশি।
দ্বিতীয় পর্যায়, যেখানে জন্মহার বেশী এবং মৃত্যুহার কম।
তৃতীয় পর্যায়, যেখানে জন্ম এবং মৃত্যু উভয়ের হার কম।

জনবিন্যাসের রূপান্তরের তথ্য দেখলে, এটা সহজেই যাচাই করা যায় যে, ভারতবর্ষে 1981-1921 এই বছরগুলি জনবিন্যাস রূপান্তরের প্রথম পর্যায়ে ছিল। এই সময়ে ভারতের মানুষের জীবনযাত্রা খুবই
অবহেলিত ছিল, কারণ সেই সময়ে জন্ম-মৃত্যু হার খুবই উচ্চ ছিল, বলা যায় প্রায় সমান সমান।
জনসংখ্যা রূপান্তরের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় 1921 সালের পর, এই সময় ভারত বর্ষ বিপুল জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাক্ষী। এই পর্যায়ে উচ্চ জন্মহার এবং কম মৃত্যুহার দেখা যায়, ফলে ভারতের জনসংখ্যা হু হু করে বাড়তে থাকে। 1921 সাল থেকে ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে প্রথম আদমশুমারি বা জনগননা হয় 1951 সালে। এই পর্যায়ে জনসংখ্যা 25 কোটি থেকে 36 কোটিতে এসে পৌঁছায়। সুতরাং, স্বাধীনতার পর পরই ভারতবর্ষের ঘাড়ে এক বিশাল জনসংখ্যার চাপ এসে পড়ে।
সামাজিক উন্নতির যে সূচকগুলি যেমন - সাক্ষরতার হার এবং মৃত্যু হার প্রভৃতিও খুব একটা আশাপ্রদ ছিলনা। সেই সময় ভারতের সাক্ষরতার হার ছিল মাত্র 16 শতাংশ। এবং মহিলাদের সাক্ষরতার হার ছিল খুবই নগণ্য মাত্র 7 শতাংশ। সর্বোপরি মৃত্যুহার ছিল খুবই বেশি। বিশেষত শিশুমৃত্যু হার ছিল খুবই বিপদ্জনক। সেই সময় প্রতি হাজারে শিশু মৃত্যু ছিল 218, যেটা 2016 তে এসে প্রতি হাজারে দাঁড়িয়েছে মাত্র 41. মানুষের জীবনের গড় আয়ুও ছিল খুব কম মাত্র 32 বছর, যেটা 2016 সালে 69 হয়েছে।
উল্লেখিত এইসব তথ্যগুলির দ্বারা আমরা বুঝতে পারছি যে, তৎকালীন ভারতবর্ষের জনসাধারণের চিকিৎসাব্যবস্থার হাল ছিল খুবই অপর্যাপ্ত ও অপ্রতুল। পাশাপাশি জল ও বায়ুবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাবের কারণে প্রতিবছর প্রচুর মানুষ মারা যেত।

বৃত্তিমূলক জীবিকা কাঠামো:-

বিভিন্ন শিল্প ক্ষেত্র ও কর্মক্ষেত্রে যে বিপুল সংখ্যক মানুষ নানা ধরনের পেশা বা জীবিকা নির্বাহ করেন, তাকেই জীবিকা কাঠামো রূপে ধরা হয়েছে। ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে এই সমস্ত পেশার বিন্যাস সামান্য হলেও পরিবর্তিত হয়েছিল। এর মধ্যে প্রায় 70-75 শতাংশ মানুষই কৃষি ক্ষেত্রে নিয়োজিত ছিলেন, অর্থাৎ কৃষি ক্ষেত্রে অধিক শ্রম বিনিয়োগ হতো। বাকি শিল্প এবং অন্যান্য পেশায় যথাক্রমে 10 শতাংশ এবং 16-20 শতাংশ শ্রমিক নিয়োজিত ছিল। এটাও লক্ষনীয় যে বিকশিত অর্থনীতিতে অর্থাৎ যেখানে অর্থনীতির উন্নতির হার উচ্চ, সেখানকার মানুষ সময়ের সাথে সাথে পেশাগত ভাবে কৃষি কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন শিল্প ক্ষেত্র বা অন্যান্য পেশাকে জীবিকা হিসেবে বেছে নেয়। কিন্তু প্রায় দুশ বছরের ইংরেজ শাসনের পরেও ভারত কিন্তু কৃষিপ্রধান দেশ হিসেবেই পরিচিত ছিল এবং স্বাধীনতার পরে ভারতবর্ষের সেই পরিচিতিই ছিল।

মূলত প্রধান দুটি কারণ এতে কাজ করেছিল। প্রথমত, ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে, মোগল সাম্রাজ্যে ও বিভিন্ন রাজা ও শাসকদের শাসনকালে এবং তাদের সহযোগিতায় ভারতবর্ষে হস্তশিল্পের প্রচুর রমরমা ছিল, ব্রিটিশরা যখন ভারত আক্রমন করলো ও মুঘলদের পরাজিত করে ভারত বর্ষ দখল করল, সেই সময় সমস্ত হস্তশিল্প অর্থ সাহায্যের অভাবে ধ্বংস হতে লাগলো। ফলে, সেই সমস্ত শ্রমিকরা নিরুপায় হয়ে গ্রামে ফিরে গিয়ে চাষাবাদ শুরু করল এবং কালক্রমে কৃষিকাজই হয়ে উঠল তাদের প্রধান জীবিকা। দ্বিতীয়তঃ, ইংরেজরা, ইংল্যান্ডে কলকারখানার জন্য কাঁচামালের

জোগান দিতে ভারতের কৃষকদের অর্থ প্রদান করে কৃষি কাজ করতে উৎসাহ প্রদান করতে লাগলো। ফলে একটা সুদীর্ঘ সময় ধরে কৃষিকাজ ভারতের প্রধান জীবিকা হয়ে রইল।
অন্যদিকে জীবিকার ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান আঞ্চলিক বৈষম্য ছিল একটি লক্ষণীয় বিষয়। মহারাষ্ট্র, বাংলা, তৎকালীন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি (বর্তমানে তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ কেরালা এবং কর্ণাটক রাজ্যের সম্মিলিত এলাকা) -তে উল্লেখযোগ্যভাবে কৃষিক্ষেত্রে নির্ভরশীল শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছিল ও অন্যান্য কর্মক্ষেত্র ও শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিক সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছিল। অন্যদিকে, একই সময়ে উড়িষ্যা, রাজস্থান, পাঞ্জাবের মত রাজ্যগুলোতে কৃষি ক্ষেত্রে নিয়োজিত শ্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছিল।

পরিকাঠামো:-

ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতবর্ষে কিছু মৌলিক পরিকাঠামো যেমন- রেল, বন্দর, জল পরিবহন এবং টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছিল। 1850 সালে ভারতে রেল পথের সূচনায় ব্রিটিশদের এক উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। ভারতে মানুষের মধ্যে ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক দূরত্বের অবসান ঘটাতে রেল এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছিল ও জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে ভারত কে ঐক্যবদ্ধ করতে রেলপথের ভূমিকা অপরিসীম।
যাইহোক ভারতে এই সমস্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলার পেছনে অবশ্যই ইংরেজদের নিজস্ব বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক পরিকল্পনা ছিল, যা নিচে আলোচনা করা হয়েছে:-

1. ভারতের বিভিন্ন গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে সড়ক ও রেলপথে বিভিন্ন ধরনের কাঁচামাল বন্দরে পৌঁছানো হতো, ইংল্যান্ডে বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী প্রস্তুত করার জন্য। এই সমস্ত কাঁচামাল থেকে প্রস্তুত দ্রব্যসামগ্রী ইংল্যান্ডের বিভিন্ন কল-কারখানায় তৈরি হতো। পরে এই সমস্ত সামগ্রীই আবার জাহাজের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসিত বিভিন্ন উপনিবেশগুলোতে প্রেরিত হতো। ভারত ছিল এই কাঁচামাল প্রেরিত করার এবং প্রস্তুত দ্রব্য সামগ্রী চড়া দামে বিক্রির এক বিরাট বাজার। যা বন্দর থেকে বিভিন্ন সড়ক ও রেলপথে ভারতের বাজারে পৌঁছাতে। এই কারণে ভারতের অর্থনীতিকে বলা হত- ‘ফিডার অর্থনীতি’ বা “মেষপালকের অর্থনীতি”।

2. ভারতবর্ষ ছাড়াও ব্রিটিশদের আরো অনেক উপনিবেশ ছিল, যেখানে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেই থাকত। ফলে ইংরেজদের সেনাবাহিনীতে নিয়োগের জন্য মানবসম্পদ প্রয়োজন হতো, যাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে সেই সব জায়গায় সড়ক ও রেলপথে পাঠানো হতো, যেখানে যুদ্ধ-বিগ্রহ হত। সেই কারণে, সড়ক ও রেলপথে পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত করা খুবই প্রয়োজনীয় ছিল। ভারতের মধ্যেও সেনাবাহিনীকে বিভিন্ন জায়গায় খবরদারি চালানো ও নিয়ন্ত্রণ জন্য পরিকাঠামোর প্রয়োজন ছিল।

3. সড়ক ও রেলপথে প্রস্তুত দ্রব্য সামগ্রী পরিবাহিত হতো এবং এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বিভিন্ন ঔপনিবেশিক অঞ্চল গুলিতে পরিবাহিত হতো এবং নানাভাবে পণ্যসামগ্রীর আদান-প্রদানের জন্য। এর দ্বারা ব্রিটিশ সরকার প্রচুর অর্থ উপার্জন করতো।

4. ব্রিটিশ সরকার দ্বারা যা'ই পরিকাঠামো তৈরি হোক না কেন, তা থেকে ভারতবাসীর খুব একটা লাভ হয়নি। কারণ সেই সমস্ত পরিকাঠামো ভারতের মতো দেশে অপর্যাপ্ত ও সীমাবদ্ধ ছিল। গ্রামীণ মানুষের কাছে সেই সুফল পৌছায়নি। তারা প্রান্তিকই রয়ে গেছেন। একে তো সারা বছরই গ্রামাঞ্চলের রাস্তা-ঘাটের অব্যবস্থা যা বর্ষাকালে চরমে পৌছাত, তার উপর প্রায়শঃই ঘটে যাওয়া নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও বন্যা মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। তাছাড়াও কৃষির বাণিজ্য করনের ফলে গ্রামীণ মানুষের স্ব-নির্ভরতাও ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ফলে ভারতে রেল ব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলে প্রাপ্ত সামাজিক সুফল গুলি দেশের ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির নিচে চাপা পড়ে গিয়েছিল।সড়ক ও রেল ব্যবস্থার উন্নয়নের সাথে সাথে উপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় সামুদ্রিক পরিবহন এবং অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য প্রসারের জন্য পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল যদিও সেই সব প্রচেষ্টা সফল হয়নি। ভারতের আভ্যন্তরীণ জল বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তা অসফল হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে উড়িষ্যার উপকূলবর্তী অঞ্চলে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে খাল খনন করা হয়েছিল। কিন্তু এই খাল খননের পাশাপাশি রেল ব্যবস্থা চালু হওয়ায় খালটির প্রতিযোগিতায় টিকতে পারেনি। এবং এই প্রকল্পটি পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছিল।

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার প্রচলন ব্রিটিশ ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো। 1850 সালে কলকাতা থেকে ডায়মন্ড হারবার এর মধ্যে সর্বপ্রথম বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা প্রচলন হয়। 1851 সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির টেলিগ্রাফ ব্যবহার শুরু করে। 1853 সালে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলকে টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা সাহায্যে যোগাযোগের ব্যবস্থা হয় যার মধ্যে কলকাতা এবং পেশোয়ার, আগ্রা, বোম্বে অধুনা মুম্বাই এবং চেন্নাই উল্লেখযোগ্য। 1854 সালে জনসাধারণের মধ্যে টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার সুফল পৌঁছে দেওয়ার জন্য একটি আলাদা বিভাগ খোলা হয়।
অবশেষে 1881 সালে যখন ইংল্যান্ডের সরকার কর্তৃক ওরিয়েন্টাল টেলিফোন কোম্পানির লাইসেন্স মঞ্জুর করে, কলকাতা, বোম্বে, মাদ্রাজ এবং আহমেদাবাদের টেলিফোন এক্সচেঞ্জ অফিস খোলার জন্য, যার ফলে 1881 সালে ভারতবর্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে টেলিফোন সার্ভিস প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ একটি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন, তথাপি এটি প্রধানত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থেই ব্যবহৃত হতো। টেলিগ্রাফ এবং ডাক ও যোগাযোগ ব্যবস্থার একটি উপকারী গণমাধ্যম হলেও ব্রিটিশ ভারতে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরেই ছিল এবং অবশ্যই অপর্যাপ্ত ছিল।

কৃষিক্ষেত্র

ব্রিটিশরা ভারতে আসার আগে এদেশে কৃষিকাজের অবস্থা খুবই সন্তোষজনক ছিল। ফরাসি ভ্রমণকারী বার্নিয়ারের মতে, বাংলার নৌচলাচল ও সেচের জন্য গঙ্গা থেকে উৎপত্তি হওয়া অসংখ্য খাল ছিল এবং এর ফলে প্রচুর পরিমাণে গম, শাকসবজি, পাখি, হাঁস, রাজহাঁস উৎপাদন হতো যা তাদের নিজেদের জন্যই ব্যবহৃত হতো। এখান থেকে বিপুল পরিমাণে সুতি, রেশম, চাল, চিনি ও মাখন রপ্তানি করা হতো। শুকর, ভেড়া, ছাগল ও বিভিন্ন রকমের মাছের ও এখানে প্রচুর পরিমাণে চাষ করা হতো। বার্নিয়ারের মতে বাংলা মিশরের চেয়েও সমৃদ্ধ ছিল। তবে বিপরীতক্রমে ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতবর্ষের কৃষি কাজে স্থবিরতা দেখা দেয়। চাষযোগ্য জমির পরিমাণের সম্প্রসারণের কারণে কৃষি কার্যের কিছুটা উন্নতি হলেও, কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা কম ছিল।

এর জন্য অনেক কারণ ছিল প্রথমত, শহরাঞ্চলে হস্তশিল্পের বিনাশ মানুষকে গ্রামাঞ্চলে বসতি স্থাপনে ও কৃষিকে প্রধান জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিল।
দ্বিতীয়তঃ ইংল্যান্ডের শিল্পের জন্য ভারত থেকে তুলা, নীল ইত্যাদি কাঁচামালের রপ্তানির প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এর জন্য ব্রিটিশ প্রতিনিধিরা নগদ অর্থ দিয়ে কৃষকদের কাছ থেকে এই সমস্ত কাঁচামাল কিনতেন। সুতরাং কৃষকরা ও নগদ অর্থের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে খাদ্যশস্যের বদলে এইসব ফসলের চাষ শুরু করেছিলেন।
নগদ টাকায় ফসলের এই বিকাশ কে বলা হয় ভারতীয় কৃষির বাণিজ্যিকরণ। তৃতীয়তঃ পূর্বোক্ত কারণ দুটির জন্য জনসংখ্যার 85 শতাংশ কৃষি ক্ষেত্রের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে যা কৃষির ওপর প্রবল চাপের সৃষ্টি করে। স্বাধীনতার সময় এই সংখ্যাটি ছিল প্রায় 75 শতাংশ এবং এটি খুব বেশি। বিপুল জনসংখ্যার চাপ ও প্রবল বেকারত্ব এর জন্য দায়ী ছিল। চতুর্থত, ঔপনিবেশিক সরকার রাজস্ব আদায়ের জন্য জমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে জমিদারি প্রথার প্রবর্তন করেছিল। অনুরূপভাবে বিভিন্ন ধরনের বন্দোবস্ত দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও চালু হয়েছিল। এইসব জমিদারদের একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব আদায় ও জমা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছিল এবং তারা যদি এটা না পারতো তাহলে তারা তাদের জমিদারী হারাতেন এবং সেই কারণেই জমিদাররা প্রজাদের উন্নতির কথা না ভেবে, রাজস্ব আদায়কেই মূল লক্ষ্য হিসাবে বেছে নিয়েছিলেনও তার জন্য তারা সমস্ত রকমের প্রচেষ্টা চালাতেন, এমনকি শক্তিপ্রয়োগেও পিছপা হতেন না।
পঞ্চমত নিম্নস্তরের প্রযুক্তি, অপ্রতুল সেচ ব্যবস্থা এবং সারের নগণ্য ব্যবহার কৃষকদের দুর্দশা বাড়িয়ে তোলে এবং এটি কৃষিক্ষেত্রে নিম্ন উৎপাদনের অন্যতম কারণ হয়ে ওঠে।
ষষ্ঠতঃ অবিভক্ত দেশের উর্বরা-উত্তম সেচসুবিধা সম্পন্ন একটি বড় অংশ পাকিস্তানে চলে যায়। ভারতের পাটশিল্প, যা তৎকালীন সময়ে বিশ্ববাজারে একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করেছিল, সেটিও প্রভূত সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়ে। কারণ পাট উৎপাদনের প্রায় সমস্ত জমি পূর্ব পাকিস্তান (অধুনা বাংলাদেশ) এর অন্তর্গত হয়েছিল।

শিল্পক্ষেত্রে

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের কিছু আধুনিক শিল্প স্থাপিত হয়। প্রাথমিকভাবে এই উন্নয়ন তুলো ও পাট টেক্সটাইল কারখানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। সুতি টেক্সটাইল কারখানাগুলির বেশিরভাগই মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের মত পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যগুলোতে স্থাপিত হয়েছিল। অপরদিকে পাটকলগুলো স্থাপিত হয়েছিল বাংলায়। তুলো কল গুলি বেশিরভাগই ভারতীয় মালিকানাধীন হলেও অধিকাংশ পাটকল গুলি ছিল বিদেশি মালিকানাধীন। তবে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটেছিল বিংশ শতাব্দীর শুরুতে টাটা আয়রন এন্ড স্টীল 1907 সালে ভারতীয় শিল্পে এর অন্তর্ভুক্তি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর চিনি, সিমেন্ট শিল্পের জন্য কিছু কল-কারখানার আবির্ভাব ঘটেছিল।

কিন্তু ভারতের শিল্পায়নের পরবর্তী পর্যায়ে আরও অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনী দ্রব্য-শিল্প যেমন বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও উৎপাদনকারী শিল্পের অভাব ছিল। সুতরাং কৃষিকাজের মত শিল্পক্ষেত্রেও ভিত্তি গঠন করার ক্ষেত্রে ভারত বর্ষ আশানুরূপ কাজ করতে পারেনি। ব্রিটিশদের আবির্ভাবে অভ্যন্তরীণ যুদ্ধের ফলে হস্তশিল্প ধ্বংস হয়েছিল,5 যা আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

এবং এর ফলে ব্যাপক বেকারত্বের সৃষ্টি হয়েছে। এবং মানুষ গ্রামাঞ্চলে গিয়ে কৃষিকাজ কে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। ফলে এটি কৃষির উপর বড় বোঝা হিসাবে পরিণত হয়েছিল। তবে ভারতের ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্পের সামগ্রিক অবলুপ্তির বিকল্প হিসেবে যত্রতত্র স্থাপিত হওয়া কিছু উৎপাদন শিল্প কারখানা যথেষ্ঠ ছিলো না। উপরন্তু নতুন শিল্পক্ষেত্রের বৃদ্ধির হার এবং মোট উৎপাদনে এর অবদান ছিল খুবই নগণ্য। জরুরী বিষয় হল, ঔপনিবেশিক নীতি নির্দিষ্ট দুটি কারণে ভারতে শিল্পায়নের বিরুদ্ধে ছিল। প্রথমটি ব্রিটেনে আসন্ন আধুনিক শিল্প গুলির প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল সরবরাহ কারী দেশ হিসেবে পরিণত হওয়া এবং দ্বিতীয়ত এই শিল্প গুলি থেকে উৎপন্ন পণ্যের জন্য ভারতকেই একটি বিস্তৃত বাজারে পরিণত করা।

বৈদেশিক বাণিজ্য:-

কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে উৎপাদিত পণ্যের প্রতুলতার কারণে ভারত প্রাচীনকাল থেকে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক দেশ হিসেবে পরিচিত। কৃষিজাতদ্রব্যের বাণিজ্যিকীকরণের ফলে ভারতবর্ষে বিভিন্ন মৌলিক দ্রব্য যেমন কাঁচা রেশম, তুলো, নিল, চিনি, পাট, উল প্রভৃতি পণ্যের রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে পরিণত হতে বাধ্য হয়েছিল। এই সমস্ত দ্রব্যের রপ্তানি মূলত ইংল্যান্ডেই হতো যেখানে এই সমস্ত কাঁচামাল ব্যবহার করে নানা পণ্য সামগ্রী ও ভোগ্যবস্তু তৈরি হতো, এবং পুনরায় সেই সমস্ত ভোগ্য সামগ্রী ভারতে রপ্তানি হতো। আবার ভারতে যেহেতু এইসব কাঁচামাল থেকে ভোগ্য পণ্য তৈরি করার যথেষ্ট কল কারখানা ছিল না তাই ভারত ব্রিটেন থেকেই এই সমস্ত ভোগ্য পণ্য অর্থাৎ সুতির বস্ত্র এবং বিভিন্ন মূলধনী দ্রব্য যেমন হালকা যন্ত্রপাতি আমদানি করতে শুরু করলো। ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্রিটেন ভারতের বাজারে একচেটিয়া অধিকার কায়েম করেছিল। অর্ধেকের বেশি বাণিজ্যই বৃটেনের দ্বারা অধিকৃত ছিল। 1869 সালের সুয়েজ খাল খননের ফলে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বৃটেনের এই আধিপত্য আরো বেশি করে প্রতিষ্ঠা করেছিল। এই বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে, যা বিদেশি মুদ্রা রোজগার হতো তার বেশিরভাগই ব্রিটিশ শাসকগণ আরো অন্যান্য ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী কাজে ব্যবহার করত, অর্থাৎ বর্ধিত আয় ভারতের কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে ব্যয় না করে তা সৈন্য সংখ্যা ও অস্ত্রশস্ত্র মজুদ করতে খরচা হত। যার ফলে ভারতের অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়ে ও ভারতের সম্পদ সম্পূর্ণভাবে ভারতের বাইরে চলে যায়। ব্রিটেন ছাড়া চীন, সিংহল (শ্রীলংকা) এবং পারস্যের (ইরান) সাথে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল।

সারাংশ:-

1921 সালে ভারতে যে জনগণনা হয়েছিল তা ছিল জনবিন্যাস এর দ্বিতীয় পর্যায় অর্থাৎ উচ্চহারে জনসংখ্যার বৃদ্ধি সেইসময়ের শিক্ষাব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যমান এটাই ইঙ্গিত করে যে জীবন যাত্রার গুণগতমান ছিল খুবই নিম্নমানের, মোট জনসংখ্যার 84 শতাংশই ছিল নিরক্ষর। ভারতের মানুষের গড় আয়ু ছিলো মাত্র 32 বছর। শিশু মৃত্যুর হার ছিল রীতিমত বিপদজনক, হাজারে 281 জন। ব্রিটিশ ভারতের গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো ছিল রেল পরিবহন ব্যবস্থা, যদিও তা প্রধানত ইংল্যান্ডের কাঁচামালের যোগান ও সেনাবাহিনীকে বিভিন্ন ঔপনিবেশিক অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করতেই অধিক ব্যবহৃত হতো। ভারতের মানুষের কাজে রেলপথ ব্যবহার হয়নি তা কেবলমাত্র বৃটেনের শিল্প

বিপ্লবের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। ভারতের মানুষ প্রায় তিন-চতুর্থাংশই কৃষি কাজের উপর নির্ভরশীল ছিলেন, যার ফলে ব্রিটিশ ইন্ডিয়া শিল্প ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছিল এবং কৃষি ক্ষেত্রেও শুধুমাত্র প্রাথমিক উৎপাদিত পণ্যের দেশ হিসেবেই পরিচিত পেল। ইতিমধ্যে কৃষিক্ষেত্রে উদ্‌বৃত্ত শ্রমিক ও স্বল্প উৎপাদনশীলতার প্রভাব পড়েছিল ব্যাপক জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে। এছাড়া জমিদারি প্রথা ও বাণিজ্যিকীকরণের ফলে ভারতে ব্যাপক অর্থনৈতিক অপ্রতুলতা দেখা দিয়েছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতের প্রধান সঙ্গী সেই ব্রিটেনই থাকাতে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য কে তারা সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করে ভারতের সম্পদকে পূর্ণরূপে ভারতের বাইরে নিয়ে যেতে পারল এবং ক্রমশই ভারতে এক প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যা ভারতীয়দের মনোবল তলানিতে পৌঁছাবার জন্য যথেষ্ট ছিল।